শরদিন্দুর গল্প : ইতিহাসের প্রত্ন নিয়ে সাহিত্যের প্রতিমা

দেবলীনা মুখোপাধ্যায় (শেঠ)

১

'সেই ভালো, প্রতিযুগ আনে না আপন অবসান
সম্পূর্ণ করে না তার গান;
অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস রেখে দিয়ে যায় সে বাতাসে।
তাই যবে পরযুগে বাঁশির উচ্ছ্বাসে
বেজে ওঠে গানখানি
তার মাঝে সুদূরের বাণী
কোথায় লুকায়ে থাকে, কী বলে সে বুঝিতে কে পারে'।

শরদিন্দুর ইতিহাসের গল্পগুলো আবার ফিরে পড়তে গিয়ে মনে পড়ে গেল 'পূরবী'র 'অতীতকাল' কবিতাটি। ভাগ্যিস, অতীত আর বর্তমানের মধ্যে স্বচ্ছন্দ যাওয়া-আসার এই সুযোগ আছে। সেকালের রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ নিয়ে একালে বসে গল্প-কবিতা যেমন লেখাই যায়, টুকরো হয়ে যাওয়া বর্তমানের খণ্ডচ্ছিন্নতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বপ্নের সফরে ভেসে যাওয়াই যায় নিমাই পণ্ডিতের সমকালীন নবদ্বীপ থেকে মুঘল যুগকে ছুঁয়ে, খলজিদের ভারতকেও পিছনে ফেলে সুদূর গুপ্তযুগ হয়ে বৌদ্ধ ভারতে। ফির্‌তি চলনে বাধাই নেই যখন, কল্পনার উড়ানে ফিরে যাওয়াই যায় পৌরাণিক ভারতে—যখন নিজগুণে বরুণদেবকে সরিয়ে ইন্দ্র হয়ে উঠছেন ভারতসভ্যতার প্রথম যথার্থ অধিনেতা। কিংবা সেই প্রাগৈতিহাসিক বনচরদের যুগে, যখন নখদাঁত ছাড়া অন্য অস্ত্রের ব্যবহার আদিম কোনো জনজাতি জানতই না। স্বপ্ন আর কল্পনায় বিনে ভাড়ার সওয়ারি যখন হওয়াই যায়, তখন চতুর্থ শতকের মধ্য এশিয়ার মরুসমুদ্রের চালচিত্রে কিংবা পাঁচ হাজার বছরের সুপ্রাচীন মিশরেতিহাসেও ফিরে যাওয়া যেতেই পারে।

সবটাই সম্ভব, যদি গভীর অভিনিবেশে আর ভালোবাসায় ইতিহাসকে অধিগত করা যায় আর কল্পনার সঙ্গে রোমান্সকে মেশানোর অমিত শক্তি থাকে লেখকের।

যেমন বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা আমাদের শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা জানি, বিজ্ঞানীরা মাত্র কয়েক টুকরো হাড়, দাঁত, রোমের শিলীভূত নিদর্শনের সাহায্যে প্রতিভার মন্ত্রবলে অধুনালুপ্ত কত প্রাণীর অস্তিত্বের কল্পনা করতে পারেন। ঠিক তেমনি, কল্পনা আর প্রতিভার মন্ত্রবলে দূর ইতিহাসের সামান্য কয়েকটা তথ্যের কঙ্কালের মধ্যে কোনো কোনো গল্পকার প্রাণসঞ্চার করতে পারেন। অনায়াস দক্ষতায় নিঁখুত ফুটিয়ে তুলতে পারেন সেই সময়ের আর্থসমাজের খুঁটিনাটি। পোশাক-আশাক, খাদ্যাভাস, যানবাহন ব্যবস্থা, গৃহসজ্জার পদ্ধতি, কথোপকথনের ধরণ, বাণিজ্যরীতি—সবটাই। 'রক্তসন্ধ্যা' গল্পে শরদিন্দু প্রাসঙ্গিকভাবে জানান তাঁর ইতিহাসমগ্নতার কথা। —'ছেলেবেলা হইতেই আমি ইতিহাসের ভক্ত।' কিন্তু ইতিহাসের কারবার তথ্য নিয়ে—আর লেখক তো সত্যের উপাসক! তাহলে ইতিহাসের গল্পে তথ্য আর সত্যের আদানপ্রদান হবে কেমন করে? প্রথম গল্পগ্রন্থ 'জাতিস্মরে'র ভূমিকায় শরদিন্দু এ প্রসঙ্গে নিজের অভিমত স্পষ্টভাবে জানান। —'ইতিহাসের ঘটনাকে যথাযথ বিবৃত করাই ঐতিহাসিক গল্পের উদ্দেশ্য বলিয়া আমার মনে হয় না। তাৎকালিক আবহাওয়া যদি কিছুও সৃষ্টি করতে পারি, তবেই উদ্যম সার্থক হইয়াছে জানিব।' অর্থাৎ তথ্যের অনুপুঙ্খ ব্যবহার নয়। ইতিহাসে পাওয়া সেকালের আবহ যদি সত্য হয়ে ফুটে ওঠে সংবেদনশীল পাঠকের মনে, গল্পকার শরদিন্দুর বক্তব্য, তাহলেই ইতিহাসের গল্প বা উপন্যাসের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ বোধকরি একেই 'ইতিহাসের রস' বলে চিহ্নিত করে বলেছিলেন, 'ইতিহাসের সংস্রব উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে। ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ .....।'[১] কিংবা গল্পকারের।

দীর্ঘদিন এমনটাই ভাবা হত, ইতিহাসের সাহিত্য হয়ে ওঠাটা আসলে তথ্যের আলপথ ধরে সাহিত্যের সত্য হয়ে ওঠা। কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সাহিত্যের সত্য থেকে ইতিহাসের তথ্য নির্মিতির তাগিদও সমানভাবে অনুভূত হচ্ছে। রোমিলা থাপার বলেছেন, "Archaeology is now the major source of fresh evidence, since it is unlikely that large numbers of literary sources still remains to be discovered."[২] কখনো কখনো সাহিত্য ইতিহাসের নির্ভুল তথ্য সরবরাহ করতেই পারে। রামকথা, ভারতকথা তো নির্দিষ্ট সময়ের সর্বজনবিদিত সমাজেতিহাসই। 'রাজতরঙ্গিণী' থেকে শুরু করে কালিদাস-শূদ্রকের রচনা কিংবা আকবরনামা, জাহানারানামা অথবা মঙ্গলকাব্য—সবকিছুতেই সুপ্ত থাকে ইতিহাসের তথ্য। আজকের ইতিহাসবিদ সেই উল্টোপথেও ইতিহাস খোঁজেন। আর লেখক? —কোনোভাবেই ইতিহাসের তথ্যের cut-copy-paste-এর পথ মাড়ান না। বরং 'কেরী সাহেবের মুন্‌শী' গ্রন্থে 'লেখকের বক্তব্যে' প্রমথনাথ বিশীর কথা সমর্থন করে বলতেই পারেন, 'ইতিহাসের সত্য ও ইতিহাসের সম্ভাবনা ঐতিহাসিক উপন্যাসের উপাদান। ইতিহাসের সত্য অবিচল, তাকে বিকৃত করা চলে না। ইতিহাসের সম্ভাবনায় কিছু স্বাধীনতা আছে

লেখকের। সত্যের অপব্যবহার করিনি, সম্ভাবনার যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছি।' ঠিক একই কথা বলতে পারতেন ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার শরদিন্দু তাঁর ইতিহাসের গল্পোপন্যাস প্রসঙ্গে। 'ইতিহাসের সত্যে' অবিচল থেকে 'ইতিহাসের সম্ভাবনা' বা probability-র ডানায় ভর করে তাঁর স্বপ্নের উড়ান।

২

প্রথম গল্পগ্রন্থ 'জাতিস্মর' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩২-এ। চল্লিশ বছর ধরে লিখেছেন অজস্র গল্প। ১৯৭২-এ আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত 'উত্তম মধ্যম' পর্যন্ত মোট ২২টি গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে গল্পগুলি। চালচিত্রটা বেশ বড়। তবু গল্পকার শরদিন্দু যেন উপেক্ষিত। কম আলোচিত। বিষয়বৈচিত্র্যের জন্য সব গল্পগুলি এক প্রবন্ধের মোড়কে আনা অসম্ভব। এমনকি সব ধারার গল্পগুলি ছুঁয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। বরং তাঁর ইতিহাসাশ্রয়ী গল্পমালা আলোচনার জন্য বেছে নেওয়া যেতে পারে। সাধর্ম্য একটাই। ব্যোমকেশ বা বরদার গল্পে তো বটেই, সামাজিক গল্পে এবং আমাদের আলোচ্য এই ইতিহাসের গল্পগুলিতেও—যে শরদিন্দুকে আমরা পাই, তিনি আদ্যন্ত এক তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক—নিঁখুত observer। আর তাঁর সব গল্পগুলি পড়লেই পাঠকমনে সঞ্চারিত হয় তাৎক্ষণিক এক মুগ্ধতার বোধ। মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায় 'ত্বরিতানন্দ'। ইতিহাসের গল্পে উপ্‌রি পাওনা, বিষয়-কল্পনা এবং ভাষার মনিকাঞ্চন যোগ।

'জাতিস্মর' গ্রন্থে ছিল তিনটি গল্প—'রুমাহরণ', 'অমিতাভ' এবং 'মৃৎপ্রদীপ'। গুহাবাসী অরণ্যচর মানুষের প্রাক্‌ইতিহাস, ষোড়শ মহাজনপদের চালচিত্রে বুদ্ধদেবের আলোকসামান্য আবির্ভাব এবং চতুর্থ শতকের গোড়ায় প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (৩১৯-৩৩০ খ্রিঃ) রণবীর চন্দ্রবর্মার পাটলিপুত্র আক্রমণের ইতিহাস। তিনটি গল্পই দূর ইতিহাস কথা বলে। আর সেই সেকাল-একালের অনায়াস সেতুবন্ধ করেন শরদিন্দু অভিনব জাতিস্মর কল্পনার আশ্রয়ে। তাঁর লেখা সতেরোটি ঐতিহাসিক গল্পের মধ্যে পাঁচটিতে এই পদ্ধতির প্রয়োগ। 'জাতিস্মর' গ্রন্থের এই তিনটি গল্প ছাড়াও তালিকায় রয়েছে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শিশুনাগ বংশের শাসনকালের কালপটভূমিতে লেখা 'বিষকন্যা' এবং পঞ্চদশ শতকে উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ভাস্কো ডা গামার নেতৃত্বে পর্তুগিজ নাবিকদের ভারতে অনুপ্রবেশ নিয়ে লেখা 'রক্তসন্ধ্যা'। পাঁচটি গল্প ইতিহাসের পাঁচটি সময়কে চিহ্নিত করে। প্রতিটি গল্পেই ইতিহাসের সত্যের উপর শরদিন্দু কল্পনার প্রলেপ দেন, আর তাকে বসিয়ে দেন জাতিস্মরতার ফ্রেমে। 'অমিতাভ' গল্পে যেমন বলেন, "ঘরের কোণে বসিয়া লিখিতেছি, আর ধূম কুণ্ডলীর মতো বর্তমান জগৎ আমার সম্মুখ হইতে মিলাইয়া যাইতেছে। আর একটি মায়াময় জগৎ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। সেই দূর পূর্বস্মৃতিতে প্রয়াণের সুযোগ পায় যারা, শরদিন্দুর গল্পে আশ্চর্যভাবে তারা নেহাতই সাধারণ মানুষ। রেলের কেরানি। লেখাপড়া এন্ট্রান্স পর্যন্ত। কিন্তু রাজগীরে ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে সেই মানুষেরই চোখের সামনে থেকে

সরে যায় কালের যবনিকা। দু'তিন হাজার বছরের সভ্যতার বহতা পেরিয়ে সেই মানুষটাই আবিষ্কার করে নিজেকে কখনো দাস, কখনো সম্রাটের পরিচয়ে। মিউজিয়মের শিলালিপি দেখে তার মনে পড়ে যায় কুষাণরাজ কণিষ্কের যুগে সে ছিল রাজভাস্কর পুণ্ডরীক। কত জীবনের কত ছিন্ন ঘটনা এমনি করে মিলে জুড়ে যায় তার চোখের সামনে। তৈরি হয় ইতিহাসের অনিঃশেষ প্রবাহপথ। 'রুমাহরণ' গল্পের রেলের কেরানি আবার হিমাচল-হিমালয়ে বেড়াতে গিয়ে নেহাতই এক গানের সুরে পিছিয়ে যায় কল্প-কল্পান্ত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অরণ্যচর গাক্কা আবিষ্কার করে জন্মজন্মান্তরের রুমাকে। আর 'রক্তসন্ধ্যা' গল্পে কলকাতার দুর্গাচরণ ব্যানার্জি লেনের কসাই গোলাম কাদের, হঠাৎই দোকানে এক নবাগত পর্তুগিজ ফিরিঙ্গিকে দেখে ভয়ংকর উত্তেজনায় গোমাংস কাটার ছুরি দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে সেই ক্রেতাকে। প্রতিবার ছুরিকাঘাতের সময় প্রলাপের মত বলতে থাকে 'ভাস্কো ডা গামা'—'ভাস্কো ডা গামা'। মাংসের ব্যাপারী গোলাম কাদের মুহূর্তেই ঐ লোকটাকে দেখে ফিরে যায় পঞ্চদশ শতকের কালিকটে। হয়ে ওঠে মির্জা দাউদ বিন্ গোলাম সিদকী। আর ক্রেতা ডিরোজা? —জাতিস্মরের চোখে সে তখন ইতিহাসের খলনায়ক। তার স্ত্রী-সন্তান-বাবা-মা-আত্মীয় পরিজনের হন্তাকারী 'শঠ-বিশ্বাসঘাতক-মিথ্যাবাদী-শয়তান' ডা-গামা।

'মৃৎপ্রদীপ' এবং 'বিষকন্যা' লেখকের স্বগতোক্তির বয়ানে লেখা। 'মৃৎপ্রদীপে' লেখক আবিষ্কার করেন নিজেকে, প্রথম চন্দ্রগুপ্তের বয়স্য চক্রায়ুধ ঈশানবর্মার সাজে। আর 'বিষকন্যা'য়? —লেখক বলেন, 'জন্মজন্মান্তরের জীবন তো আমার নখদর্পণে, সহস্র জন্মের ব্যথা-বেদনা-আনন্দের ইতিহাস তো এই জাতিস্মরের মস্তিষ্কের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে।' —কিন্তু কে ছিলেন তিনি? — রাজা চণ্ডের বিদূষক বটুকভট্ট, না মন্ত্রী শিবামিশ্র? —বর্বর চণ্ডরাজ, না রাজা সেনজিৎ? — অনুক্তই থেকে যায়। অবশ্য নির্দিষ্ট করে বলার প্রয়োজনও নেই। শুধু সেই জাতিস্মরের চোখে দেখে নিই আমরা শিশুনাগবংশের পরম্পরা। আর দূর ইতিহাস বর্তমানের আঙিনায় এসে পড়ে এই অভিনব কৌশলের নিপুণ প্রয়োগে।

কিন্তু কেন বারবার জাতিস্মর? শরদিন্দু কি বিশ্বাস করতেন জাতিস্মরে? — আমরা নিশ্চিত নই। যদিও সুকুমার সেনের অনুমান '..... বিশ্বাসী ছিলেন কিনা ঠিক জানি না—বোধহয় ছিলেন।'[৩] স্বয়ং লেখক 'জাতিস্মর' গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় সাহিত্যে জাতিস্মর-পদ্ধতির প্রয়োগের দুই পথপ্রদর্শক জ্যাক লণ্ডন এবং আর্থার কোনান ডয়েলের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। আর 'বিষকন্যা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'সেতু' গল্পে এই জাতিস্মরতার ফ্রেম বিষয়ে ব্যক্ত করেছেন তাঁর নিজস্ব অভিমত। —প্রশ্ন তাঁর, 'জাগ্রত চেতনার' মধ্যে যে অভিজ্ঞতা কখনোই আসার নয়, কেমন করে তা ফুটে ওঠে মনের দর্পণে? —'একি স্বপ্ন? না আমারই মগ্নচৈতন্যের স্মৃতিকন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিল আমার পূর্বতন জীবনের ইতিবৃত্ত! পূর্বতন জীবন বলিয়া

কিছু কি আছে? মৃত্যু হয় জানি, কিন্তু সেইখানেই তো সব শেষ। আবার সেই শেষটাকে শুরু ধরিয়া নূতন কোন জীবন আরম্ভ হয় নাকি?' —শরদিন্দুর বিশ্বাস, হয়। আর হয় বলেই শরদিন্দু জাতিস্মর কল্পনার সাহচর্যে জন্মজন্মান্তরের 'বিস্মরণের বৈতরণী' পেরিয়ে যান অনায়াস সহজতায়।

৩

'বিষকন্যা' গল্পে জাতিস্মর-লেখকের চোখের সামনে থেকে যখন কালের মোহাবরণ সরে যায় মনে হয়, '..... যতই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমার বিগত জীবনের আলোচনা করি না কেন, দেখতে পাই কোনও না কোনও নারীকে কেন্দ্র করিয়া আমার জীবন আবর্তিত হইয়াছে।' —'বিষকন্যা'য় যেমন উল্কা, 'মৃৎপ্রদীপে' সোমদত্তা। আর 'রুমাহরণে' বনচর জনজাতির গাক্কার জীবনটাই তো বদলে গিয়েছিল রুমাকে ঘিরে। অবশ্য শুধু এই জাতিস্মর কল্পনার গল্পেই নয়—ইতিহাসাশ্রয়ী অন্য গল্পগুলিতেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বহু রাজপরিবারের এবং ভারতেতিহাসেরও ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে ওঠে নারীশক্তি। ভারতে আগত আর্যজাতির তখন 'নবীন যৌবন'। তখনো তারা থিতু হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা শুরু করেনি। খুব সম্ভব, সময়টা ভারতকথা, রামকথারও আগে। বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করে অনাবিষ্কৃত ভারত-ভূখণ্ড আবিষ্কারের নেশায় দুই বন্ধু মঘবা আর প্রদ্যুম্ন দক্ষিণাবর্তে গিয়ে পৌঁছায়। অনার্য জনজাতির সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয় আর্যরাই। আমরা 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ' গল্পটির কথা বলছি। বিজিত জনজাতির মেয়েদের বিয়ে করে আর্য সৈন্যেরা। মিশে যায় আর্য-অনার্য রক্ত। সেই শুরু। অনার্য রাজকন্যা, বন্দিনী এলা এসে দাঁড়ায় মঘবা-প্রদ্যুম্নের-মাঝখানে। এলাকে আর্যভাষায় সুশিক্ষিত করে তোলা হয়। এই সমাজেতিহাসের যথাযথ চিত্রণের পর গল্পে রোমান্সের আবর্ত তৈরি হয়, মঘবা-এলা-প্রদ্যুম্নকে ঘিরে। আর্যরাজের সঙ্গে অনার্য জনজাতির গোষ্ঠীপ্রধানের কন্যার বিবাহও হয়। সেই নারীকে কেন্দ্র করেই জীবনাবর্তন। —এ সেই দূর-ইতিহাস, যখন সময়ের বহতা বিভক্ত হয়নি সপ্তাহ-মাস-বছরে। চন্দ্র-সূর্যগ্রহণের ব্যবধান যখন সময়মাপক।

চতুর্থ শতকের শেষার্ধে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য যখন ভারতের অধীশ্বর (৩৭৫-৪১৪ খ্রিষ্টাব্দ), উজ্জয়িনী যখন নবরত্নে শোভিত—কালিদাস লিখে চলেছেন কুমারসম্ভব কাব্য। সপ্তম সর্গ পর্যন্ত লিখে থম্‌কে গিয়েছে তাঁর লেখনী। অষ্টম সর্গ কি সত্যিই কালিদাস রচিত? —এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন গল্পকার 'অষ্টম সর্গ' গল্পে। কাব্যনাম কুমারসম্ভব। কিন্তু ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রমতে বিবাহপরবর্তী দাম্পত্য সহবাস কাব্য বা নাট্যে অবর্ণনীয়। কী করবেন কালিদাস? কে তাঁকে পথ দেখাবে? আসে আবার সেই নারী। 'চতুঃষষ্টিকলার পারংগতা অলোকসামান্যা বারবধূ প্রিয়দর্শিকা।' মহাকবিকে বুঝিয়ে দেয় সে নারী, কাব্যশাস্ত্রের চেয়ে জীবনসত্য অনেক বড়। রচিত হয় অষ্টম সর্গের কাব্যেতিহাস।

আলাউদ্দিন খল্‌জির শাসনকালে (১২৯৬-১৩১৬ খ্রিস্টাব্দ) দিল্লি এবং বিন্ধ্যাচলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের অনবদ্য চিত্রায়ন 'শঙ্খকঙ্কণ' গল্পে। ইতিহাসে কল্পনার যে বর্ণময় সুতোগুলো ছাড়া থাকে, তাই দিয়ে অনবদ্য কল্পনার নক্‌সা বোনেন গল্পকার। অবিশ্বাস্য নয় কিছুই—সম্ভাব্যতার সূত্রে সবটাই বিশ্বাসযোগ্য। আর সেই চালচিত্রে আসে দুই নারী—দুই বোন। আলাউদ্দিন খল্‌জি কর্তৃক অপহৃত বিন্ধ্যাচলের পঞ্চমপুরের রাজা ভূপ সিংহের জ্যেষ্ঠা কন্যা শিলাবতী আর কনিষ্ঠা সোমশুক্লা। এছাড়াও ছিল আলাউদ্দিনের সঙ্গে দাসী সীমন্তিনীর মিলনজাত সন্তান অপরূপা কিন্তু নির্বোধ চঞ্চরী। ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা ঐ রূপবতী চঞ্চরীর মাধ্যমে বৃদ্ধ সুলতান আলাউদ্দিনকে কঠোরতম শাস্তি দেন। ঔরসজাত সন্তান চঞ্চরীকে না-জেনে কামনা করে দুরাচারী সুলতান আর দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর চরিতার্থ হয় ভূপ সিংহের প্রতিশোধ স্পৃহা। চঞ্চরী যেন পাপজর্জর আলাউদ্দিনের চরম পরিণাম। কৃতকর্ম অবগত হওয়ার পর ভগ্নস্বাস্থ্য সুলতান বিকৃত মস্তিষ্ক হয়ে অভিশপ্ত তিনটি বছর কাটায়।

চৈতন্যদেবের আমলের নবদ্বীপ তার অনাচার নিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে 'চুয়ানন্দন' গল্পে। সময়টা ১৪২৬ শকাব্দ—১৫০৪ খ্রিষ্টাব্দ। নিমাই পণ্ডিত তখনো মুণ্ডিতমস্তক কৌপীনসম্বল মহাপ্রভু হয়ে ওঠেননি। তিনি দুর্দান্ত বিদ্বান, অসীম শক্তিধর। ক্রোশ দশেক নাগাড়ে দাঁড় টানায় তাঁর ক্লান্তি নেই। সুরসিক, তুখোড় বুদ্ধিমান এহেন নিমাই পণ্ডিতকে আমরা দেখেছি বৃন্দাবন দাস কিংবা লোচন দাসের রচনায়। গল্পে পাই তৎকালীন তন্ত্রাচারীদের তন্ত্রসাধনার নামে দুরাচারের কথাও। সমাজেতিহাসের সব তথ্য শরদিন্দু নিয়ে আসেন এক ফ্রেমে। তৈরি হয় চুয়া আর চন্দনের দুঃসাহসী রোমান্টিক গল্প। আমাদের চেনা চৈতন্যদেব বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করেছিলেন। আর এই নিমাই নিজে উপস্থিত থেকে চন্দনদাসের সঙ্গে চুয়ার মাঝনদীতে রাক্ষসবিবাহ দেন। চমৎকৃত প্রমথনাথ বিশী এই গল্প পড়ে লিখেছিলেন, '..... এমনতর মিথ্যা-সত্য ইহার আগে পড়ি নাই।'[৪]

সে গল্পে যেমন চুয়া, 'তক্ত্ মোবারকে' তেমনি পরীবানু। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সংরক্ষিত এক সিংহাসন লেখককে নিয়ে যায় সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকের মুঙ্গেরে। আলীবর্দী খাঁ তখন মুঙ্গেরের শাসক। বাদশাহ্ সাজাহান তখন সদ্যপ্রয়াত। ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধে সুজা বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় নিয়েছে মুঙ্গেরে। রাজপুরুষদের অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার, উচ্ছৃঙ্খলার বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপনা। স্বল্পায়ু, হতভাগ্য মোবারক তো মৃত্যুই বরণ করে। আর তার স্ত্রী পরীবানু চোখের জলে ভেসে জলের দরে বিকিয়ে যায় সুজার হারেমে। 'তক্ত্ মোবারক' যেন এক অভ্রান্ত অভিজ্ঞান। বুঝিয়ে দেয়, আসমুদ্র হিমাচল অত বড় মুঘল সাম্রাজ্যের অনিবার্য পতনের কারণ। —সবগুলি গল্পেই নারী রয়েছে গল্পের কেন্দ্রে। আর আমরা

পাঠকরা, সেই ইতিহাসের চালচিত্রে মুগ্ধ বিস্ময়ে আবিষ্কার করছি—এলা, উল্কা, সোমদত্তা, প্রিয়দর্শিকা, শিলাবতী-সোমশুক্লা, চুয়া কিংবা পরীবানুদের।

৪

'বিষকন্যা' গ্রন্থপাঠে মুগ্ধ মোহিতলাল মজুমদার শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়কে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আপনার সাহিত্যিক পাণ্ডিত্য এবং কল্পনাশক্তি দুই-ই আছে। '..... আপনার গল্পগুলি পড়িলে মনে হয়, আপনি সে যুগের সাহিত্য ও ইতিহাস শিক্ষার্থীর মত অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন।'[৫] শরদিন্দু তো বলেইছেন, আবাল্য তিনি 'ইতিহাসের ভক্ত'। আবার নিষ্ঠাভরে ইতিহাসের তথ্যের মালা গাঁথা ঐতিহাসিক গল্পোপন্যাসে যে লেখকের কাজ নয়—এও তিনি জানেন। তথ্যের সঙ্গে কল্পনার অভিনব রসায়নে, যদি ফুটে ওঠে সেই সময়—জমে ওঠে 'ইতিহাসের রস' — তাহলেই লেখকের সার্থকতা, পাঠকের পরিতৃপ্তি।

কী গভীর অধ্যয়ন এবং কী নিপুণ উপস্থাপন! যদি কালানুক্রমে দেখি আমরা ইতিহাসের পথরেখা, গোড়াতেই স্মরণ করতে হবে 'রুমাহরণ'। কাল সেখানে অনির্দেশ্য। মানুষ তখন গুহাবাসী। পৃথিবীর ভূখণ্ড কোনো দেশ-মহাদেশের সীমায় বিভক্ত হয়নি। আদিম মানুষের চেহারার যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, তা হুবহু নৃতাত্ত্বিকদের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়। —'জটাকৃতি চুল, রোমশ-কপিশ-বর্ণ দেহ, বাহু জানু পর্যন্ত লম্বিত। দেহ নিতান্ত খর্ব না হইলেও প্রস্থের দিকেই তাহার প্রসার বেশি।' অল্পসংখ্যক নারীদের নিয়ে জনগোষ্ঠীর পুরুষদের আদিম লড়াই, প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের ঘর বানানোর কৌশল, পাহারা দেওয়ার পদ্ধতি, মেঘ-দেবতা, পর্বত-দেবতারা আজ অজ্ঞাত নয়। লোহা তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। লেখক সুনিপুণ দক্ষতায় বেছে নেন, হরিণের শিঙের তীর, পাথুরে অস্ত্র। নৃতত্ত্ব যেটুকু তথ্য দেয়, তার ভিত্তিতে অনবদ্য গল্প। ঐ প্রাক্ ইতিহাস পর্ব নিয়েই 'ইন্দ্রতূলক'। গল্প যেখানে থামে, তারপর? —গল্পকার বলেন, 'তারপর ইতিহাস পড়'।

বুদ্ধদেব তখনো জীবিত। বিম্বিসারকে হত্যা করে অজাতশত্রু তখন মগধের শাসক (৪৯৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। লিচ্ছবি-কাশী-কোশলের মধ্যে নিত্য লড়াই। ইতিহাস বলে, রাজ্যরক্ষার্থে অজাতশত্রু রাজগৃহের প্রাকার সুরক্ষিত করে গঙ্গা-শোণের সঙ্গমের কাছে পাটলি গ্রামে দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। আর তাঁর পুত্র উদয়ী বা উদয়ভদ্র রাজধানী স্থানান্তরিত করেন পাটলিপুত্রে। ইতিহাসের এই সূত্রটুকু নিয়ে শরদিন্দুর 'অমিতাভ' গল্প। সেকালে প্রচলিত গুপ্তচরবৃত্তি, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন জ্যোতিষচর্চা, গণিকাবৃত্তি, হিন্দু-বৌদ্ধদের ধর্মসংঘাতের ইঙ্গিত। 'বিষকন্যা' ঠিক এর পরবর্তী সময়াধারিত। অজাতশত্রুর পর থেকে প্রাক্ মৌর্যযুগ পর্বে আর্যাবর্তের ষোড়শ মহাজনপদে তখন ভয়ংকর রাষ্ট্রবিপ্লব। কাশী-কোশল-লিচ্ছবি-মগধের মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক। তারই চালচিত্রে 'বিষকন্যা' উল্কার

গল্প। ঠিক যেমনটা হয়। রাজসভার শৈথিল্য, স্থূল চাটুকারিতা, দুর্বল রাজার নৃশংস স্বেচ্ছাচারিতা—প্রতিবাদী মহামন্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ডদান। ইতিহাসই অবশ্য প্রতিশোধ নেয়। দোর্দণ্ড চণ্ড-রাজ প্রজা-অভ্যুত্থানে সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য হয়। আবার ঐ দূর ইতিহাসেও বৃজি যে গণরাজ্য ছিল, সেকালের মেয়েরা যে চাইলে অস্ত্রশিক্ষা করতে পারত—তা-ও গল্পের পরতে পরতে পাঠক জেনে যায়। যেমন রাজসভা, রাজপ্রাসাদের চমকপ্রদ detailing—তেমনি সেকালের মহাশ্মশানেরও চমকপ্রদ ভয়াল বর্ণনা।

সেই প্রাচীন ভারতে গুপ্তচরবৃত্তির বহুল প্রচলন ছিল। 'মৃৎপ্রদীপ' গল্পের সোমদত্তা তো গুপ্তচরই ছিল। এককালে বহু যুদ্ধের নায়ক প্রথম চন্দ্রগুপ্ত রাজা হয়ে লিচ্ছবি রাজদুহিতা, পট্টমহাদেবী কুমারদেবীর প্রশাসনিক দাপটে কীভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে মৃগয়ায় বিলাস-ব্যসনে দিন কাটাতে লাগলেন—আর সেই সুযোগে দিগ্বিজয়ী বীর চন্দ্রবর্মা গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করলেন—এইটুকুই ইতিহাসের তথ্য। সেই পাথুরে তথ্যে প্রাণসঞ্চার করল চক্রায়ুধ ঈশানবর্মার রূপমুগ্ধতা কিংবা সোমদত্তার করণীয় ভুলে রাজার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা।

সেই চতুর্থ শতকে যুদ্ধযাত্রার অনুপুঙ্খ যেমন মেলে—তেমনি পাই হিন্দু শাসনকালে বৌদ্ধ বিহারগুলির দুরবস্থার ছবি। রাজা বদলায়—ধর্মচিহ্নও বদলে যায়। —'বুদ্ধের মূর্তি, ধর্মচক্র প্রভৃতি যাহা ছিল তাহা অপসারিত করিয়া তৎপরিবর্তে দেবমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে।' —ধরলেন কেমন করে ঐ আবহ? লেখক 'জাতিস্মর' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র কিংবা বাৎস্যায়নের কামসূত্র থেকে বহু উপাদান পেয়েছেন। আবার 'অষ্টম সর্গ' গল্পে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সমকালীন উজ্জয়িনীর অভিজাত যাপনের রেখাচিত্র। 'দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে' সেই মানসযাত্রায় অমরসিংহ, বেতালভট্ট কিংবা বরাহমিহিরের যেমন দেখা মেলে —তেমনি কপোতিকা, ময়ূরিকা, মঞ্জরিকার মত সুরসিকা নাগরীর সঙ্গেও পরিচয় হয়। কাব্যও তো কখনো কখনো ইতিহাস নির্মাণে সহায়তা করে। তাই কালিদাসের কাব্য থেকে যেমন রবীন্দ্রনাথ চয়ন করে নিয়েছিলেন তাঁর পূর্বজন্মের প্রথম প্রিয়ার অঙ্গাভরণ, অলঙ্করণ—এখানেও তারই অনুসৃতি। মহাবিদুষী বারমুখ্যা যে কেমন করে সেকালের নগরসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল, প্রিয়দর্শিকা যেন তারই অভিজ্ঞান। আমরা জানি, এই কালিদাস, উজ্জয়িনী, শিপ্রাতীর শরদিন্দুর অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। 'কুমারসম্ভবের কবি' উপন্যাসে ফিরে আসে আবার এই কালপর্ব।

এই সময়েই ৩৯৯-৪১৪ খ্রিস্টাব্দে পদব্রজে ভারতভূমি পর্যটনে আসেন বৌদ্ধ চিনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন। তাঁর ভারতভ্রমণ বৃত্তান্তের সূত্রেই 'চন্দনমূর্তি' গল্পটি। ভিক্ষু অভিরামের মনে জাগে অভিনব এক প্রশ্ন। এই যে পৃথিবী জুড়ে লক্ষকোটি বুদ্ধমূর্তি—সবটাই কি ভক্তশিল্পীর কল্পমূর্তি বা 'ভাবমূর্তি'? তথাগতের প্রকৃত রূপকৃতি

কি কেউ জানে না? কোথাও নেই? লেখক বিভূতিবাবু এখানে ইতিহাসের গবেষক। তিনি নিশ্চিত, 'একটা বাস্তব মডেল তাদের ছিলই।' আর সেই সূত্রেই ফা-হিয়েন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে জেতবন বৌদ্ধ বিহারে বুদ্ধদেবের জীবিতাবস্থায় চন্দনকাঠে তৈরি একতম বুদ্ধমূর্তির অস্তিত্বের সন্ধান মেলে। সেই তথ্যসূত্রেই ভিক্ষু এবং ইতিহাস গবেষকের হিমাচল যাত্রা এবং রুদ্ধশ্বাস আবেগে মূর্তিসন্ধান। কিন্তু বলব কি ইতিহাসের গল্প? —সেই প্রাচীন বৈশালীর ধ্বংসাবশেষ, শিলালিপিতে তুর্কী আক্রমণের আতঙ্ক, বুদ্ধস্তম্ভ, বৌদ্ধবিহার ধ্বংসের ইতিহাস। 'ভারতের ভাগ্যবিপর্যয়ের একটা ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ'। সুতরাং নয় কেন? — মূর্তি যখন ভিক্ষু অভিরামের অধিগত হওয়ার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত, ঠিক সেই মুহূর্তে পয়লা মাঘ, ১৩৪১-এর (১৫ জানুয়ারি, ১৯৩৪) নেপাল-বিহার-হিমালয় সংলগ্ন ভূখণ্ডের ঐতিহাসিক ভয়াবহ ভূকম্প। পায়ের নীচে নৃত্যোন্মাদ পাহাড়। বুদ্ধস্তম্ভ প্রলয়ংকর সমুদ্রঝড়ে জাহাজের ভাঙা মাস্তুল যেন। মাটি আঁকড়ে বাঁচার চেষ্টা করতে করতে ইতিহাসের গবেষক বিভূতিবাবু চোখের সামনে দেখলেন চন্দনকাঠের বুদ্ধমূর্তি আর ভিক্ষুকে বুকে নিয়ে—অতল খাদে তলিয়ে গেল বুদ্ধস্তম্ভ। ছিন্ন হল অতীত-বর্তমানের যোগসূত্র। 'বাস্তব মডেল' চোখে দেখার শেষ সুযোগ। ঐ চতুর্থ পঞ্চম শতকেই মধ্য এশিয়ার দিক্‌সীমাহীন মরুভূমির বালি আর বাতাসের ভয়ংকর মরুগ্রাসে এক বৌদ্ধসংঘের সব অধিবাসীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। জীবিত থাকে শুধু সংঘস্থবির পিথুমিত্ত এবং ভিক্ষু উচগু। আর কোথা থেকে সেই সংঘে এসে পড়ে দুই মানবশিশু —নির্বাণ আর ইতি। বুদ্ধ-তথাগতর সংঘছায়ায় জনহীন মরুপ্রান্তরে চারটি মানুষের জীবনসংগ্রাম। গল্পকার বলেন, এক সূত্র ছিল উৎসে। খবরের কাগজে পড়েছিলেন, 'মধ্য এশিয়ার মরুভূমিতে বালুস্তূপের ভিতর প্রোথিত সংঘের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।'[৬] এই তথ্যটি মনের মধ্যে রসায়িত হয়ে, রোমান্টিক কবিকল্পনায় জারিত হয়ে ভাষা পায় 'মরু ও সংঘ'। ইতিহাস রস এ গল্পে যতটা উৎসারিত হয়, তার থেকে তীব্র হয়ে ওঠে ইতিহাসের চালচিত্রে সেই দার্শনিক প্রশ্ন—সুকঠোর আচারিক ধর্ম সত্যিই কি শান্তি দেয়? মুক্তি দেয় জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে?

এরপর সময়ের নাব্যতায় কেটে যায় প্রায় আটশো বছর। প্রাচীন ভারতের খোলনলচে বদলে যায় ইসলামী শাসনে। আলাউদ্দিন খল্‌জি শক্তি আর কৌশলে চতুর্দশ শতকের প্রারম্ভে আসমুদ্রহিমাচল আধিপত্য বিস্তার করেন। আর তাঁর শাসনকালের ভারত উঠে আসে, 'রেবা রোধসি' এবং 'শঙ্খকঙ্কণ' গল্পে। আলাউদ্দিন খল্‌জির ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেনাপতি মালিক কফুরের অংশটুকু বাদ দিলে 'রেবা রোধসি'কে ঠিক ঐতিহাসিক গল্প না-ই বলা যেতে পারে। কিন্তু 'শঙ্খকঙ্কণ' যেন খলজি শাসনে মধ্যভারত এবং দিল্লির সমাজেতিহাস। ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে বৃদ্ধ পিতৃব্য জালালউদ্দিনকে হত্যা করে সিংহাসন লাভ, দাক্ষিণাত্য অভিযান, দূর দেবগিরি বিজয়,

গুজরাটরানি কমলাদেবীকে বন্দী করে এনে বিবাহ, চিতোররানি পদ্মিনীকে সুলতানী হারেমে আনতে না পারার ব্যর্থতা—সব তথ্যই যথাযথ। অনবদ্য এবং অকাট্য তাঁর সাতপুরা শৈলমালার এহেন নামকরণের বিশ্লেষণ। —'সাতপুরা শৈলমালার জটিল আবর্তের মধ্যে এই সময় সাতটি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। হয়তো সাতপুরা পর্বতের নাম এই সাতটি রাজ্য হইতে আসিয়াছে।' নর্মদা এবং তাপ্তির প্রবাহপথ মধ্যবর্তী সাতটি রাজ্য ছিল স্নিগ্ধ শান্ত। কিন্তু পঞ্চমপুরে এল, তাঁবু ফেলল আলাউদ্দিনের সৈন্যদল। আর বদলে গেল মানুষদের যাপনের ধরণটাই। ব্যভিচার, গুপ্তহত্যা, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধস্পৃহা বদলে দিল পাহাড়ী সুখী মানুষগুলোকেই। পঞ্চমপুর, সপ্তমপুর এবং রাজধানী দিল্লি এই গল্পের স্থলপটভূমি।

ময়ূর-চঞ্চরীর নগরদর্শনের সহযাত্রী হয়ে আমরাও দেখে নিতে পারি সেকালের দিল্লির খুঁটিনাটি। ইসলাম শক্তির স্মারক কুতুবমিনার, পান্থশালা, দরিদ্র হিন্দু পল্লী, মুসলমান মহল্লা, শঠ মামুদ, সুরসিকা পসারিনী। সে শহরে নির্ভুলভাবে মূলমাপক 'দ্রম্ম'—'ফলের দাম এক দ্রম্ম'। আবার মেয়ে বিকিকিনি হয় মোহরের বিনিময়ে। রাস্তাঘাটে খেলা-আমোদের দেদার আয়োজন—আবার খুন-রাহাজানিও রোজকার ঘটনা। সবমিলিয়ে দিল্লি জমজমাট। লক্ষণীয়, গল্পকারের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ। কালের বহতায় কী আশ্চর্য detailing এ বদলে যায় রাজধানীগুলির চেহারা। 'বিষকন্যা'র শিশুনাগবংশীয় মগধ—'মৃৎপ্রদীপে'র গুপ্তযুগের মগধ—বিক্রমাদিত্যের সংস্কৃতিতীর্থ উজ্জয়িনী কিংবা 'শঙ্খকঙ্কণে'র দিল্লি! বঙ্কিমচন্দ্র তো বলেইছিলেন, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই'। শরদিন্দুও 'রেবা রোধসি' গল্পে বলেন, 'আমরা অতীতকে বড় সহজে ভুলিয়া যাই, তাই বোধহয় আমাদের ইতিহাসের প্রতি আসক্তি নাই।' ইতিহাসমগ্নতা এবং গভীর অধ্যয়নেই 'চুয়াচন্দন' হয়ে ওঠে পঞ্চদশ শতকের বাংলা আর বাঙালির আর্থসামাজিক ইতিহাস। বাঙালির বাণিজ্যযাত্রার চাঁদ-ধনপতিদের বিস্মৃতপ্রায় ঐতিহ্য মনে পড়ে যায়, চন্দনদাসের মধুকর ডিঙা নিয়ে নবদ্বীপের ঘাটে নৌকা লাগানোর প্রসঙ্গে। তখনো সমুদ্রবাহী বাণিজ্যতরী নবদ্বীপের পথে নিয়মিত যাতায়াত করত। রাজশক্তি তখন পাঠানের হাতে। দেশ অরাজক এবং সমাজ বহুরাজক। ব্রাহ্মণ্যের কোনো গরিমা নেই। মাধবদের মত জমিদারেরা পাপাচারের সঙ্গে ধর্মের ভণ্ডামি মিশিয়ে তৈরি করার চেষ্টা করছে নতুন ধরণের আমোদ আর বিলাসিতা। তন্ত্রসাধনার নামে অবলীলায় চলছে শিথিল যৌনাচার। লেখকের কথায়, 'মৃত বৌদ্ধধর্মের শবনির্গলিত তন্ত্রবাদের সহিত শাক্ত ও শৈব মতবাদ মিশ্রিত হইয়া যে বীভৎস বামাচার উত্থিত হইয়াছে—তাহাই আকণ্ঠ পান করিয়া বাঙালী অন্ধ মত্ততায় অধঃপথের পানে স্খলিতপদে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ..... প্রকৃত মনুষ্যত্বের চর্চা দেশ হইতে যেন উঠিয়া গিয়াছে।' তৈরি হয় যায় টুলো পণ্ডিত নদের নিমাইয়ের চৈতন্যদেব হয়ে ওঠার সামাজিক প্রেক্ষিত। চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলি থেকে নির্ভুলভাবে

শরদিন্দু সংগ্রহ করেন সেকালের ইতিহাস। চন্দনদাস আর চুয়ার রোমান্স অভ্রান্তভাবে স্থাপন করেন সেই চালচিত্রে।

শরদিন্দু 'রক্তসন্ধ্যা' গল্পের উপাদান পেয়েছিলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রচিত 'ফিরিঙ্গি বণিক' গ্রন্থটি থেকে। ১৪৯৮ এর আশপাশের মালাবার উপকূলের সেই 'মহার্ঘ' মণিখণ্ডের মত সমুদ্রবন্দর কালিকট। হিন্দু-মুসলমান বাণিজ্যজীবীর সেই কসমোপল—যেখানে তুরস্ক, পারস্য, আরব, মরক্কো থেকে বহু ব্যবসায়ীর সমাগম। চীন থেকে লঙ্কা, দারুশিল্প, ব্রহ্মদেশ থেকে হাতির দাঁত—সেকালের বাণিজ্যতীর্থ বঙ্গ থেকে পট্টবস্ত্র, মলমল, ব্যাঘ্রচর্ম, দাক্ষিণাত্য থেকে অগরু, দারুচিনি, লঙ্কাদেশের মুক্তো এসে বোঝাই করত কালিকটের বাজার। পশ্চিমী সদাগর সোনার বিনিময়ে জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে যেত সেসব। এহেন কালিকটে এসে ভিড়ল পর্তুগিজ জলদস্যুদের জাহাজ। কিন্তু এল কোন্ পথে? গল্পকার নির্ভুলভাবে চিনিয়ে দেন সদ্য আবিষ্কৃত উত্তমাশা অন্তরীপের পথ। পেড্রো এবং ভাস্কো ডা গামার নেতৃত্বে নবাগত এই নাবিকরা যখন নগণ্য সব জিনিস দ্বিগুণ, চতুর্গুণ দামে কিনতে থাকে, নির্বোধ ব্যবসায়ীরা খুব উৎফুল্ল হলেও মির্জা দাউদের মত বহুদর্শী বিচক্ষণ শ্রেষ্ঠীরা কিন্তু প্রমাদ গোণেন। পর্তুগিজরা তো বাণিজ্য বোঝে! তাহলে বাণিজ্য কি ছলমাত্র? — অন্য কোনো দুরভিসন্ধি আছে? —তারপর প্রভাকরের আনা জাহাজ বোঝাই অপূর্ব সুক্ষ্ম মলমল নিয়ে মির্জা দাউদ আর ডা-গামার ভয়ানক অসিযুদ্ধ। সেই দফায় ফিরতে হয় ডা-গামাকে। দু'বছর পর পাদ্রী আল্‌ভারেজ কেবলারের নেতৃত্বে কালিকটে নৃশংস গোলাবর্ষণ ইতিহাসসম্মত। তারও দু'বছর পরে মক্কা শরিফ ফেরত মির্জা দাউদের জাহাজ আক্রমণ, লড়াই, গোটা পরিবারকে নৃশংস হনন লেখকের কল্পনাজাত হলেও সম্ভাব্যতার সূত্রে অনায়াসে তাকে মিলিয়ে নেওয়া যায়। ভারতেতিহাসের ক্রান্তিকালে কোলাহলমুখর বন্দর-শহর কালিকটের একান্ত বিশ্বাসযোগ্য documentation-এর সাহায্যে গল্পকার চিহ্নিত করলেন উপনিবেশ স্থাপনের প্রাক্‌মুহূর্তটি। আর জাতিস্মর গোলাম সিদ্‌কীর সূত্রে জুড়ে দিলেন তা বর্তমানের সঙ্গে। তথ্য ইতিহাসে পাওয়া — কিন্তু প্রাণ তো ইতিহাসের নয়! — বিশুদ্ধ সাহিত্যের বহু সাধনার ধন। আর শরদিন্দু সেই সাধনার সিদ্ধ পুরুষ।

'চুয়াচন্দনে' আমরা পেয়েছিলাম তরুণ নিমাই পণ্ডিতকে। চৈতন্যজীবনী কাব্যে তবু তো তাঁকে পাই। কিন্তু কিশোর শিবাজী? —প্রমথনাথ বিশী বলেন, 'কিশোর শিবাজীকে আমরা কোথাও দেখি নাই'।[৭] কিন্তু অনবদ্য শরদিন্দুর observation। ঘোড়ায় চড়া শিবাজীর যে ছবি আমরা সচরাচর দেখি, তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে আঁকা হল বালক শিবাজী বা শিব্বার অনবদ্য রেখাচিত্র, 'বয়স বোধ করি ষোল বৎসরও অতিক্রম করে নাই; দেহের বর্ণ শ্যাম, কিন্তু মুখের গঠন অতিশয় ধারালো। মৃদঙ্গ-সদৃশ মুখের মধ্যস্থলে শ্যেনচক্ষুর মতো নাসিকা এই অল্প

বয়সেই তাহার মুখে শিকারীর মতো একটা শাণিত তীব্রতা আনিয়া দিয়াছে। ..... সহসা এই বালকের মুখ দেখিলে একটা অপূর্ব বিভ্রম জন্মে, মনে হয় যেন একখানা তীক্ষ্মধার বাঁকা কৃপাণ সূর্যালোকে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।' দাদো আর শিব্বার পাহাড়ী পথে চলতে চলতে ঐ কল্পসংলাপে ফুটে ওঠে সপ্তদশ শতকে, ঔরংজেবের আমলে মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থানের ইতিহাস। পাহাড়ী মাওলীদের অত্যাচার, বিজাপুর-মারাঠা সংঘাত, ভোঁসলেদের শক্তিবৃদ্ধি—সর্বোপরি শাহজীর ক্ষমতাবান হয়ে ওঠার ইতিহাসনিষ্ঠ সত্য। আর যে শিবাজী ক্ষুদ্র শক্তি হয়েও কূটকৌশলে জীবনভোর নাস্তানাবুদ করেছেন আলমগীর বাদশাহ্‌কে—গল্পকারের দক্ষতায় তাঁর হয়ে ওঠার ইঙ্গিতও মেলে। দাদো জানতে চান, অতর্কিতে জনা পঞ্চাশেক ডাকাত আক্রমণ করলে শিবাজী কী করবে। কিশোর শিবাজী অকপটে জানায়, সে পালাবে। ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে দাদো বলেন, ক্ষত্রিয়ের ছেলে হয়ে ভয়ে পালাবে সে? —বালক বলে, 'ভয়! পালানোর সঙ্গে ভয়ের সম্পর্ক কি? পালাব, কারণ পালালেই আমার সুবিধে হবে, পরে ডাকাতদের জব্দ করতে পারব।' দাদো বলেন, যুদ্ধে শক্তিমানের জয় নিশ্চিত। কিশোরের পাল্টা প্রশ্ন, 'আর যার শক্তি কম, সে যদি চালাকি করে জিতে যায়?' — সেই শিবাজী তৈরি হচ্ছে, যে ফলের ঝুড়িতে লুকিয়ে দিল্লির কড়া নিরাপত্তার চোখে ধূলো দিয়ে পুণায় পালিয়ে আসে। ইতিহাস অনুসন্ধান আর অনুমানের নিঁখুত যুগলবন্দি।

৫

'রুমাহরণ' থেকে 'বাঘের বাচ্চা'। প্রাক্-ইতিহাস থেকে শিবাজীর সমকাল —সপ্তদশ শতক। সতোরোটি গল্প ছুঁয়ে যায় ইতিহাসের অনিরুদ্ধ বহতার এক একটি মুহূর্ত। নিজের ডায়ারিতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, 'আমি বাঙ্গালীকে তাহার প্রাচীন tradition-এর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি। .... যে জাতির ইতিহাস নাই, তাহার ভবিষ্যৎ নাই।'[৮] শরদিন্দুর সময় নির্বাচনের ধরণটা লক্ষণীয়। সমৃদ্ধির ইতিহাস নিয়ে একমাত্র 'অষ্টম সর্গ'। বিক্রমাদিত্যের সমকাল। বাকি সব গল্পের চালচিত্রেই ইতিহাসের কোনো পালাবদল বা ক্রান্তিকাল অথবা নতুন কোনো শক্তির উত্থান। কেন বারবার? —আসলে সমৃদ্ধির মধ্যগগনে মানুষের মন কানায় কানায় পূর্ণ যখন, সেই সর্বশান্তির পরিপূর্ণতায়, কল্পনা ওড়ার খোলা আকাশ পায়না। যখন সবকিছুই যথাযথ, সেই আর্থসামাজিক স্থিতাবস্থায় ঘটনার ওঠাপড়া, মানুষের টানাপোড়েন, স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা ততটা তীব্র হয়ে ওঠে না। তাই শরদিন্দুর গল্পে ফিরে আসে বারবার অস্থির সময়ের কালপটভূমি। এই অস্থিরতা যেমন রাজনীতিতে—তেমনি ভারতের ধর্মের ইতিহাসেও। 'চন্দনমূর্তি' গল্পে শরদিন্দু লিখছেন, 'আমাদের দেশ ধর্মোন্মত্ততার মল্লভূমি।' ধর্ম নিয়ে সংঘাত তাঁর ঐতিহাসিক গল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। 'অমিতাভ', 'মরু ও সঙ্ঘ' এবং 'চন্দনমূর্তি' গল্পে